OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 41
Website: https://tirj.org.in, Page No. 363 - 370
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 363 - 370
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

‘শবরচরিত’ উপন্যাসে আদিবাসী নারীদের কর্মজীবন ও সমাজজীবন

মন্দিরা মুর্মু
গবেষক, বাংলা বিভাগ
মেদিনীপুর কলেজ (অটোনমাস)
Email ID : mandmurmu@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Tribal women, jangalmahal's women, multidimensional life, lodhashabar women,career, Namal,forest rights, social life.

Abstract
Tribal communities can be observed living on the southwestern border of west bengal. The social life of these tribals is deeply connected with the natural environment. Fiction writer Nalini Bera has published many works in the Bengali literary world, focusing on the so-called non-Aryan Bharatvarsha, i.e. the unexplored marginal regions. The novel 'Shabarcharit' is written around the daily events of that marginal region. The novel can be called the history of the Lodha Shabar nation. In this novel, just as the identity of the lives of tribal women is found, so too is the picture of their constant struggle to survive with their own society and the outside society. They simultaneously fight for gender, caste, education and food. These women who survive by working constantly suffer from self-criticism and job-criticism. They are determined to break the traditional social customs that deprive tribal women of their freedom. Various elements related to the multidimensional life of tribal women are seen in the novel. Women of the Lodha Shabar caste continue to handle the overall responsibility of the family throughout their lives. Therefore, while collecting various necessary materials in the forest and jungle, girls and old people can be seen in groups. In this society, women of all ages have equal responsibilities. This class of people, who are not used to farming, depend on the forest and jungle for their livelihood. Therefore, they enter the deep forest in groups in rows to search for vegetables, mahul, chhatus, etc. But there they have to be oppressed by the guards. When their rights over the forest and jungle are reduced due to the Forest Act, they become helpless and go east to work. There too, the evil eye of the outside world falls on the Lodha Shabar women, resulting in the downfall of the 'trees' of the society, i.e. the girls. Even in educational institutions, lower class girls have to suffer various kinds of harassment. A Lodha girl has tried to reach the source of light from this dark society. The hope of the entire Lodha society is on her. It remains to be seen how far this stubborn, courageous girl can take their society forward. This article is written keeping in mind the daily incidents that happen to Lodha,

Shabar, and Santal women. The issues mentioned in the novel are the main basis of this article.

Discussion

পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ-পশ্চিম তীরবর্তী অঞ্চলকে জঙ্গলমহল নামে অভিহিত করা হয়। টাঁড়-জঙ্গলে পরিপূর্ণ রুখা–সুখা কাঁকুরে লালমাটি দিয়ে আবৃত অঞ্চলে বাস করে আদিবাসী সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠীরা। এখানে বসতি স্থাপনকারীদের মধ্যে নিম্নশ্রেণির হিন্দু ও আদিবাসীরাই সংখ্যায় বেশি। তারা ঘন জঙ্গলময় প্রাকৃতিক পরিবেশকেই বেছে নেয় বসতি স্থাপন করার জন্য যেখানে তারা শান্তিপূর্ণ ভাবে দিন যাপন করতে পারে। সকলের অগোচরে স্বাচ্ছন্দ্যে নিজেদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে প্রতিপালন করে বেঁচে থাকাই যেন তাদের মূল লক্ষ্য। বৃহত্তর সমাজের থেকে বহুযোজন দূরে বসবাসের জন্য সভ্যতার ঢেউ তাদের কাছে পৌঁছাতে সময় নিয়েছে অনেকটা। এই প্রসঙ্গে বক্তব্যটি যথার্থ –

> "একমাত্র ঝাড়গ্রাম মহকুমার মধ্যেই আঞ্চলিক সংস্কৃতি একটি বিশেষ রূপ লাভ করিয়াছিল। কারণ ইহার পশ্চিম সীমান্ত ব্যাপিয়া আদিবাসী সমাজের সঙ্গে সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে উড়িষ্যার সংস্কৃতির সংমিশ্রণ অনুভব করা যায় এবং উত্তর-পশ্চিম অংশে বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়ার লোকসংস্কৃতির সঙ্গে ইহার সংমিশ্রণ ঘটিয়াছেন। নানাদিক হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া এই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক জীবন একটা বিশেষ রূপ লাভ করিবার বিশেষ সুযোগ পাইয়াছে। কারণ, এই অঞ্চল অরণ্যাকীর্ণ বলিয়া বহির্জগতের প্রভাব হইতে অনেকখানি মুক্ত থাকিবার সুযোগ পাইয়াছে।"[১]

কথাশিল্পী নলিনী বেরার কথাসাহিত্যে জঙ্গলমহলের কন্যারা বিশেষ স্থান দখল করে নিয়েছে। তাঁর লেখার জগতে কিংবা নিজ জগতে আদিবাসী নারীদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। নলিনী বেরার লেখায় আদিবাসী নারীরা বৃহৎভাবে আলোচিত না হলেও, বিশেষ ভাবে চিত্রিত হয়েছে। গ্রাম ঘরের নারীদের দিন যাপনের বাস্তব চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তাঁর লেখায়। এই নারীরা কোন দেবী সুলভ গুণে গুণান্বিত নয়, এরা একেবারে আটপৌরে সাধারণ রক্ত মাংসের মানুষ যাদের মধ্যে রয়েছে মানুষের সব রকমের লোভ, পাপ, লিপ্সা, দুঃখ, কষ্ট, সংগ্রাম ও বিদ্রোহ। যাদের রূপ বদলায় প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই। 'শবরচরিত' উপন্যাসের পটভূমি সম্পর্কে নলিনী বেরা এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, -

> "লোক উপাদান বিশেষত আমি যেগুলো ব্যবহার করি সেগুলো আমি যেখানে জন্মেছি, সেই স্থানটি হল সুবর্ণরেখা নদীর দক্ষিণ তীরবর্তী অঞ্চলটা এবং এটা উড়িষ্যা সংলগ্ন। এর মধ্যবর্তী অঞ্চল মূলত 'শবরচরিত' উপন্যাসের আধার। এই অঞ্চলের যে সমস্ত লোধা, শবর সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করত মূলত তাদের জীবনকে আধার করেই এই উপন্যাস...।"[২]

কথাকার নলিনী বেরা বহু জায়গাতে স্পষ্ট করেছেন 'শবরচরিত' ও অন্যান্য রচনাগুলোর পটভূমি সম্পর্কে। লেখক নিজের জবানিতে যা যা উচ্চারণ করেছেন তাঁর সবটাই তার যাপিত জীবনের অংশ। আশেপাশে স্থিত সমাজ ও জীবনের অকৃত্রিম গাঁথা কথা সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রদান করেছেন। সমাজ, ইতিহাসের সাথে সাথে ভৌগলিক বিচিত্র অনন্য রূপে ধরা পড়ে তাঁর লেখনীতে। দলিত ও আদিবাসী সমাজের নানান ধরনের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন কথাশিল্পী নলিনী বেরা। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তের বিশিষ্ট জনপদ লোধা-শবর জাতির সমাজ চিত্রের খুঁটিনাটি বিষয়কে কেন্দ্র করে গড়ে তুলেছেন সুবৃহৎ উপন্যাস 'শবরচরিত' (২০০৫)। সুবর্ণরেখা নদী তীরবর্তী অঞ্চলের আদিবাসী সমাজ জীবনকে নিকট থেকে দেখেছিলেন বলে নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন তাদের জীবনযাত্রা। তাঁর সাথে এই সমাজে স্থিত গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে আদিবাসী নারীদেরকে রচনায় বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। আদিবাসী নারীদের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক দিকগুলোকে সামনে রেখে কাহিনীর গতি নির্ণয় করেছেন। শিক্ষা, কর্ম, সামাজিক ঘাত-প্রতিঘাত, পারিবারিক দ্বন্দ্ব ও মূল স্রোতের সাথে জটিল সম্পর্ককে উপন্যাসে উপস্থাপন করেছেন নিজ গুনে। উপন্যাসটি পাঠ করলে জঙ্গলমহলের লোধা-শবর নারীদের বাস্তব চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। 'শবরচরিত' উপন্যাসে লোধা নারীদের জীবন সম্পর্কে আরো একটু বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া যাবে উপন্যাসের কয়েকটি লাইন দেখলে –

"শোচনীয় শালবনে আলুথালু টিলার আড়ালে
লোধাশবর ললনার কণ্ঠে ক্ষুধিত দিনের পদাবলী
মাথায় কাঠের বোঝা নবজাত শিশুটি আঁচলে
শুকনো ডালের সাথে মলিন লতার কোলাকুলি –"[৩]

আদিবাসী সমাজের নারীরা আদিকাল থেকেই স্বাধীন (অনেকাংশে) ও স্বনির্ভরশীল। শ্রমজীবী এই নারীরা সংসারের গুরুভার নিজ কাঁধে তুলে নিতে অভ্যস্ত। লোধা সমাজের নারীদের বিবাহ লগ্নেই স্বামীর খাওয়া পরার দায়িত্ব গ্রহণ করতে দেখা যায়। এই প্রথা নারীর উপর সামাজিক চক্রান্ত ও অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি বলে মনে হয়। কেননা, এই দিন থেকেই স্বামী ও সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব সারা জীবনের জন্য আমৃত্যু বহন করতে হয়। তবে অন্যদিক থেকে দেখলে এই প্রথা মন্দ নয়, কারণ এর ফলে নারীকে অর্থনৈতিক দিক থেকে আরও শক্তিশালী ও স্বাবলম্বী করে তোলে। তাই আদিবাসী সমাজে তাদের গুরুত্ব কখনোই আবছা হয়ে যায় না। আদিবাসী নারীরা অর্থের দিক দিয়ে কতটা উন্নতি করেছে তা এখানে অর্থের লাভ ক্ষতির গণনা গাণিতিক নিয়মে করা যায় না। সমাজে তাদের প্রতিপত্তি বোঝাতেই এত কথার উদ্রেক করতে হয়। আদিবাসী নারীরা সাধারণত স্বাধীন ও স্বনির্ভরশীল হয়েই বাঁচতে পছন্দ করে। এরা কর্মঠ ও চঞ্চল প্রকৃতির হয়ে থাকে। ছোটোকাল থেকে দারিদ্র্যের তাড়নায় বাবা-মায়ের সাথে হাতে হাতে কাজ করতে করতে অর্থকরী শ্রমে নিজেকে নিয়োজিত করে ফেলে। এমনকি বাড়িতেও বিনা শ্রম বিনিয়োগে অন্নগ্রাস পর্যন্ত করতে পারে না, ছোটো থেকেই স্বনির্ভরশীল হওয়ার মনোভাব গঠন করে বাড়ির অভিভাবকেরা। এই মনোভাব তৈরির পেছনে অবশ্যই দারিদ্রতা কাজ করে। এই পর্যায়ের মানুষেরা কোন না কোনোভাবে পারিবারিক ছোটখাটো কাজে শ্রম প্রদান করে থাকেই। নলিনী বেরার 'শবরচরিত' উপন্যাসের শুরুতে দেখা যায়, একদঙ্গল লোধা মেয়ের সাথে রাইবু লোধার বোন সোমবারি বেরিয়ে পড়েছে জঙ্গলে। যেখানে বনআলু, ফলমূল, শাক–পাতা, ঝাঁটি, ছাতু, কুরকুট পাওয়া যায়। সেগুলো আনার পরে হয়তো কারোর উনুনে আগুন জ্বলবে আর তাতে চড়বে হাঁড়ি। তারপর পেট ভরাবে বাড়ির পুরুষদের। তারা বাড়িতে লোধানীদের পথ চেয়ে বসে থাকে। জঙ্গলমহলের অধিকাংশ আদিবাসী নারী বন-জঙ্গলের উপর নির্ভরশীল ছিল। কর্মজীবন বলতে শুধুই পরিবারের পেট চালানোর জন্য শ্রমদান এর বাইরে গিয়ে কোনো রকম শ্রম করে অর্থ সাশ্রয় করার ভাবনা তাদের ছিল না। কারণ মূলত বস্ত্র, খাদ্য ও বাসস্থান ছাড়া অন্যান্য চাহিদা তাদের কাছে এসে পৌঁছাতে পেরেছিল না বহুদিন। পুঁথিগত শিক্ষা যেহেতু পেট ভরাতে পারে না তাই তাদের কাছে শিক্ষার কোন মূল্য ছিল না, কেবলমাত্র ক্ষুধা মেটাবার জন্য জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়ে নানান রকম প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করাকেই নিজেদের জীবনে বেশি দরকারী মনে করত। এখানে ব্যতিক্রমী হিসেবে দেখানো হয়েছে কুমারী লক্ষ্মীরানী মল্লিক চরিত্রকে যে বাকি লোধা মেয়েদের মত ঘুটে, ধানের টুঙ, চুন বানিয়ে জীবনযাপন করার কথা ভাবতে পারেনি। তার ভাবনা ছিল আকাশের মতো অসীম, লেখাপড়া করে সমাজের মূল স্রোতে পৌঁছানো তার স্বপ্ন ছিল। যেখান থেকে আলো এনে তার সমাজের আঁধার ঘুচিয়ে দিতে পারবে। তবে নেহাতই যে লোধানারীদের শখ, আহ্লাদ, চাহিদা ছিল না তা বলা যায় না! নিত্য দারিদ্র্যতাকে সঙ্গী করে একসময় তাদের শরীরে মনে ক্লান্তি এসে যেত তাই মুদি দোকানী বঙ্কা মাহাতোর বউ ভেবে ক্ষণিকের জন্য সুখ হরণ করত শিশুবালা। সে মনে মনে ভাবতো –

> "আচ্ছা সে যদি বঙ্কার বউ হত? বঙ্কা মাহাতোর বউ? তার খুবই সুখ হত। হত কী? বনে জঙ্গলে সাপখোপের ভিতর এটা - ওটা ঢুঁড়তে হত না, দিব্যি খেতে পেত, সরু সরু চিকন 'চাউড়ের' ভাত। শাড়ি ব্লাউজ কত কী পরতে পেত কাপড়-চোপড়। ভরপেট খেয়ে দুপুরে ভাতঘুম, রোদে - রোদ্দুরে ঘুরতে হত না। আড়বেলায় রুপার গাডু থেকে এক খিলি সাজা পান, দত্তা মিশানো মুখেপুরে এবাড়ি - সেবাড়ি ফুরফুর ঘুরে বেড়ানো। খালি যা রাত হলে তুলোর তুল্য বিছানায় বঙ্কার দরুণ শুয়ে থাকা।"[৪]

একঘেঁয়ে কর্মব্যস্ততার জীবনে অন্য স্বাদ পেতে বহু লোধা রমনীরা জড়িয়ে পড়ে বঙ্কা মাহাতোর মত স্বচ্ছল জীবন যাপনকারী ব্যক্তিদের সাথে।

এই অঞ্চলের আদিবাসী নারীদের কর্মস্থান, কর্ম সবই জঙ্গলকেন্দ্রিক। মরশুম অনুযায়ী জঙ্গলের নানা উপাদান সংগ্রহ করে থাকে, যা তাদের নিত্য দিনের প্রয়োজন মেটাতে সাহায্য করে। লোধা পুরুষেরা দিনের আলোয় জঙ্গলে প্রবেশ

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 41
Website: https://tirj.org.in, Page No. 363 - 370
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

করতে না পারলেও নারীরা ঠিক সিঁধিয়ে যায়। জঙ্গল থেকে কাঠ-পাতা, ছাতু, বুনো ওল, আলু, মহুল, শাক প্রভৃতি সংগ্রহ করে। এছাড়াও এগুলো বিক্রি করে চালের জোগাড় করে পরিবারের অন্ন সংস্থান করে এবং বন জঙ্গল থেকে প্রয়োজনীয় জিনিস মেয়েরা খুঁজে আনে আর তা অনেক সময় পুরুষেরা বাইরের হাটে বাজারে বিক্রি করে আসে। লোধাদের দৈনন্দিন জীবনে নারী-পুরুষের কাজ বলতে জঙ্গল থেকে নানা রকম জিনিস সংগ্রহ করা। এভাবেই প্রতিদিনের অন্ন ও অর্থ সংস্থান করতে হয় তাদের। এরকম একটি সমাজে দৈনিক চাহিদা ছাড়া জ্ঞান অর্জনের জন্য কোন রকম চাহিদা বোধ করেনা। নারী পুরুষ কাউকেই এই সমাজ থেকে শিক্ষার আঙিনায় আসতে খুব একটা দেখা যায় না। যে সমাজের পুরুষেরা নিরক্ষর সেই সমাজে নারী শিক্ষা এক বিপ্লব। ভুবন ফুলটুসীর বড় মেয়ে নুকু একমাত্র যে লেখাপড়ার জন্য হোস্টেলে থাকে। ফুলটুসি তাকে লেখাপড়ার জন্য উৎসাহ দেখালেও ভুবন দেখাতে পারেনি। সে কুট কুট করে হেসে ভাবে, লোধা জাইতে উসব করে কে? ফুলটুসি নিরক্ষর লোধানি হলেও তার মধ্যে আধুনিক চেতনা লক্ষ্য করা যায়। তারা যে সমাজে বাস করে সে সমাজের সমস্ত কিছুকে যে সমর্থন করে এমন নয়! ভুবন ধান্দার জন্য জঙ্গলের উদ্দেশ্যে রওনা দিলে অভিমানে ঘুমন্ত নুকুকে গভীর ক্ষোভে মারধর করতে করতে বলে ওঠে চোর লোধাদের বাচ্চা চোর ছাড়া কি বা হবে!

জঙ্গল মায়ের জঙ্গল সন্তানরা নিজ মায়ের কাছে খেয়াল খুশি মতো যেতে পারে না। প্রতিনিয়ত তাড়া করে বিপদ; সে কখনো পুলিশের বেশে কখনো গার্ড বাবুদের বেশে। তাই চোরের মতই প্রয়োজনে সিঁধাতে হয় জঙ্গল মায়ের গর্ভে। মাছ, কাঠ, শাক-পাতা তুলতে গেলে এই ভয়ানক বিপদকে মোকাবিলা করতে হয় রীতিমত। নারী পুরুষ নির্বিশেষে এই সমস্যার সম্মুখীন হয়। শুধু যে জঙ্গলে ঢুকলে অপরাধ তা নয়, কখনো মনে হয় লোধা জাতে জন্মানোই তাদের অপরাধ!কেন না যেখানেই চুরি হোক না কেন তল্লাশি চলে লোধা গ্রামে। ক্ষমতাধারীরা গ্রামে ঢুকে বাড়ি-ঘর জিনিসপত্র ভাঙচুর করার পাশাপাশি লোধানীদের উপরেও হামলে পড়ে জুলুমি চালায়। প্রাণভয়ে লোধা পুরুষরা প্রাণ বাঁচাতে জঙ্গলে চলে গেলে বাড়িতে পড়ে থাকে শিশুবালার মতো নারীরা যারা দারোগার শিকারে পরিণত হয়। জিজ্ঞাসাবাদ চলতে চলতে শুরু হয় ধস্তাধস্তি। দারোগার কণ্ঠে ধ্বনিত হয় নোংরা স্বর —

> “ছিঃ দুষ্টু করে না, ছিঃ! বলতে বলতে দারোগা শিশুবালাকে বুকের ভিতর জাপটে ধরে ধস্তাধস্তি শুরু করল, একসময় নাজেহাল হয়ে বলল, ইডিয়েট বুঝিস না আমার ঔরসে তোর পেটে লোধা বাচ্চা হবে না, হবে বামন বাচ্চা, - এসব ভেবেও তোর সুখ হচ্ছে না, সুখ?”[৫]

উচ্চবর্ণের মানুষদের নিজেদেরকে সর্বেসর্বা ভাবার যে প্রবণতা তা সূক্ষ্মাকারে গ্রন্থন করা হয়েছে। থানার বাবুরা যখন গাঁয়ে তল্লাশি চালায় গাঁ এফোড়-ওফোড় করে তখন ডরপুক লোধা পুরুষেরা জঙ্গল মায়ের গর্ভে আঁটারি-চুরচু কইম–কুড়চি বহড়া–পড়াশের ঝোপঝাড়ে লুকিয়ে বসে থাকে। ব্যতিক্রমী রাইবু ছাড়া কারোর সচেতনা নেই। বাড়ির মেয়ে বউয়ের নিরাপত্তা নিয়ে ভাববার অবকাশ থাকে না, আপন প্রাণ বাঁচাতে লোধা পুরুষরা লুকিয়ে পড়ে। বাড়িতে পড়ে থাকে লোধনীরা। কেউ কেউ বাবুদের নজরে পড়লে ভোগ হয়ে হয়ে যায় নিমেষে। থানার বাবুরা গাঁ লন্ডভন্ড করে ছাড়লে তখন তারা ধীরগতিতে বাসায় ফিরে আসে। এসে ভুবনের মতো লোকেরা বউকে সন্দেহে কিল মেরে মিটিয়ে নেয় নিজের ক্ষোভ। বাইরের পুরুষ বাড়ির পুরুষ সকলের থেকে অত্যাচারিত লোধানী হুঙ্কার ছাড়ে —

> “অও যদি সন্দেহ মনে, জঙ্গলে নাই সেধাঞে ঘরে বসে বহু পাহারা দিলি নাই কেনে? কেন্নে? কেন্নে? কেন্নে?’[৬]

লোধা পুরুষেরা ক্ষমতাহীন, দুর্বল ও অসহায়ত্বের অবয়ব ছাড়া আর কিচ্ছু নয়! না পারে নিজেকে রক্ষা করতে আর না পারে স্ত্রীকে রক্ষা করতে! তাই সব ক্ষোভ-রাগ মিটিয়ে নেয় নিজের স্ত্রীকে শাসন করে।

জঙ্গলমহলের আরেক কন্যা মরণী সাঁওতালিনীকে কে বা কারা ধান কাটার বিলে ধর্ষণ করে ফেলে রেখে দেয়। জঙ্গল মায়ের গর্ভেও রেহাই পায়নি মরণী, তার ইজ্জতকে হরণ করা হয়। বেলকুঁড়ি কাঁটা, রুপার পানপাতা সামনের উনিশ বছরের ‘সহরায়’ পরবে তার আর পরা হলো না। অত্যাচারীরা তাকে নিঃশেষ করে দেয়। আদিবাসী মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে যা যা বাধা আসে সেগুলো বেশিরভাগ আদিবাসী মেয়েরাই কাটিয়ে উঠতে পারে না। সামাজিক, অর্থনৈতিক বাধা ছাড়াও বাইরের জগতের অর্থাৎ তথাকথিত মূল স্রোতের সাথে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার মতো জটিল বিষয় ও এসে

যায় বাধা হিসেবে। উপন্যাসে লোধা কন্যা নুকু হোস্টেলে থাকাকালীন নানা রকম ঠাট্টা, তামাশা ও তাচ্ছিল্যের শিকার হয়। অন্য এক সাঁওতাল মেয়ে তাকেও এই একই রকম মানসিক পীড়নের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। বড় জাতের মেয়্যারা, লোকেরা হামেশাই এই ধরনের উৎপীড়ন চালায় তথাকথিত নীচু জাতির মানুষদের উপর। এরপরও দমে যায়নি যে, সে হল নকু ওরফে কুমারী লক্ষীরাণী মল্লিক। যে অশিক্ষিত সমাজের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে পা দিয়েছে মূল স্রোতে। নিজের পরিচয় প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে। সে আর পাঁচটা লোধা মাইয়ার মতন নয় নুকু, যে রাত থাকতে উঠে পাছিয়া নিয়ে গুরুর নাদি, ধানের টুঙ কুড়োতে বেরিয়ে পড়বে বাসিমুখে। আর নয়তো জঙ্গলে যাবে পাতা ছিঁড়তে ঝাঁটি কুড়োতে। খালধরে যাবে পচা শামুক কুড়িয়ে আগুনে পুড়িয়ে কলিচুন বানাতে। যা গেছে গেছে, আর নয়। তার মা এসব কাজ করতে আর পাঠায় না। গর্বিত ফুলটুসির অনেক আশা তার মেয়ে একদিন লোধাদের নাম উজ্জ্বল করবে বলে। তাই কলম-ধরা হাত আর যাবে না কাঁকড়া কি খঙ্গা খুঁজতে। নুকু পড়াশোনার পাশাপাশি কবিতা লেখে ফাংসানে স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শ্রোতা মহলে নাম প্রশংসা কুড়োয়। কঠিন বাংলাকে ছেড়ে নিজ মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষাতে নিজের ও নিজেদের অধিকারের কথা জানায়। ভুলে যায় না সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা।

“বনে জনম বনে মরণ   বন লোধাদের হকের ধন
কহে দে রাণী কহে দে মুনু, বন হামাদের মা বঠে।”[৭]

কিশোরী নুকু নিজেদের হক সম্পর্কে সচেতন তার সাহস ও অদম্য জেদ দেখে দিদিমণিরা ও রাইবু ফুলটুসিয়ারা আশা রাখে একদিন এই নুকু ওরফে কুমারী লক্ষীরানী মল্লিক লোধাশবরদের মুখ উজ্জ্বল করবে।

উচ্চবর্ণীয় মানুষদের মতোই কিছু নিয়মকানুন মেনে চলে লোধা শবররাও। বেজাতে বিয়ে তাদের সমাজে গ্রাহ্য হয় না সহজে। লোধাদের মেয়ে লোধাদের ছেড়ে আর কোথাও যেতে পারবে না। যদি বেজাতের লোককে বিয়ে করে তো, বেজাতের লোকটা লোধা পাড়াতেই আসুক। আসুক, থাকুক লোধা হয়ে যাক আপত্তি নেই, তবে সমাজের মেয়ে নিজ সমাজ ছেড়ে অন্য সমাজের অন্তর্ভুক্ত হবে তা গ্রহণীয় নয়। সন্তোষ কুমহার ও সাবিত্রীর বিয়েতে নানা জনে আপত্তি জানাতে থাকে তবে শেষঅব্দি দমিয়ে দিতে পারেনি সমাজের মানুষেরা। আধপাগলি মেয়েটাই সামাজিক বেড়া জাল ভেঙ্গে নিজের ইচ্ছেকে মর্যাদা দিয়েছে প্রেমকে সাফল্যমন্ডিত করে তুলেছে। অন্যদিকে দেখা যায়, একসময় সাঁওতাল সমাজে ‘ইতুৎ-সিঁদুর’ বাপলার চল ছিল এবং তা সামাজিকভাবে স্বীকৃতিও পেয়েছিল। তবে বর্তমানে এই বিবাহ রীতিকে রদ করা হয়েছে একে আর মান্যতা দেওয়া হয় না। কেননা এই বিবাহের নিয়ম হল কোন পুরুষ তার ইচ্ছেতে তার পছন্দ করা নারীকে ইচ্ছের বিরুদ্ধে গিয়ে সিঁদুর পরাতে পারে।আর একবার সিঁদুর দিলে তা মুছে ফেলা যায় না, পছন্দ না থাকলেও তার সাথে সংসার করতে হয় আজীবন। বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে যুক্তিহীন এই রীতিকে বর্জন করে নারীর ইচ্ছেকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। উপন্যাসে দেখা যায় কুসমি নামের সাঁওতাল যুবতীকে ছোটরাই নামক যুবক সিঁন্দুর পরাতে এলে সে রুখে দেয়।সেখানে উপস্থিত রাবণ টুডুর উক্তিতে স্পষ্ট হয় বর্তমান সমাজের রূপ –

> “এ বাবু, মেয়্যা যখন রাজি লয় তখন কাঁহাতক জোর জবরদস্তি!”[৮]
>
> “বিশ শতকের শেষে তথাকথিত অস্পৃশ্য বালক-বালিকাদের এখন আর বিদ্যালয়ের বারান্দায় বসে শিক্ষকের পড়ানো শুনতে না হলেও দরিদ্র দলিত ছাত্র-ছাত্রীরা এখনো শিক্ষক-শিক্ষিকার কাছ থেকে বর্ণহিন্দু ছাত্রছাত্রীদের মতো সমান ব্যবহার পায় না। দলিত ছাত্রছাত্রীদের প্রতি সহপাঠী বর্ণ হিন্দু ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকার ঘৃণা সূচক অবমানবিক ব্যবহার তাদের বিদ্যালয়ের দিনগুলিকে বিষময় করে তোলে। এ কথা বিশ্বাসযোগ্য না হলেও সত্যি। ফলে অনেক দলিত ছাত্রছাত্রী বিদ্যালয় ত্যাগ করে অপমান থেকে মুক্ত হয়।”[৯]

শারীরিক ও মানসিকভাবে নিপীড়িত নাবালিকা পুনোই ‘ছ্যারকানো’ বেতটাকে ‘গিরগিতি’কে ভুলে যাওয়ার জন্য তার যা যা পছন্দ সেগুলো করে যাচ্ছিল। বনে-বাদাড়ে মাঠে ঘাটে ঘুরছিল আর গেঁড়ি-গুগলি, স্মরন্তি-নাহাঙা-ঘলঘসি-চ্যাঁকা-ঘোড়াকানাশাক তুলছিল। মহুলের গুড় খাচ্ছিল। গোটা স্কুল ঘরটাকে ভুলতে চাইছিল সে। অসুস্থ সমাজের কাছ থেকে ছোট্ট প্রাণরাও রেহাই পায় না; যেখানে সমাজ গড়া হয়, গড়া হয় সমাজের আদর্শ নিষ্ঠাবান ব্যক্তিত্ব। সে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বয়ং

সমাজ ও মানুষ গড়ার কারিগরের কটু দৃষ্টি, নোংরা মানসিকতা গ্রাস করতে থাকে পুনোই-এর মতো বহু আদিবাসী নারীদের। সামাজিক বৈষম্য, জাতি ও গোষ্ঠীগত বৈষম্য এবং লিঙ্গ বৈষম্যের কঠিন যন্ত্রণাময় পরিস্থিতির শিকার হতে হয়। হাটুয়া ঘরের ছুআরা পুনোই-এর অবর্তমানে স্কুলে বসবার চট্ পা দিয়ে 'ম্যাচড়ে' নোংরা করে দেয়। মাস্টার মশাই সদ্য কিশোরী পুনোই-এর ছেঁড়া ফ্রককে বেতের ডগা দিয়ে আরও ছিঁড়ে দেন, দারিদ্রতা যাদের নিত্য সঙ্গী তাদের কাছে লেখাপড়া করা অর্থহীন। মানুষের সর্বপ্রথম প্রাথমিক চাহিদার মধ্যে অন্যতম হল খাদ্য ও পোশাক। অতি নিম্নবিত্ত মানুষদের ছেলে-মেয়েদের স্কুলে যাওয়াটাই তাদের সমাজের বিরুদ্ধে বড় এক লড়াই, যে লড়াইয়ে নুকু ওরফে কুমারী লক্ষী রানী মল্লিকের মত মেয়েরা জয়ী। এমন সমাজ থেকে উঠে আসা এক কিশোরীর প্রতি স্কুল মাস্টারের এই হীন আচরণ ও অমানবিক মন্তব্য খুবই দৃষ্টিকটূ। উক্ত ব্যবহারের ফলে বহু আদিবাসী ছেলে মেয়েরা স্কুল বিমুখ হয়ে ওঠে বর্তমানেও লক্ষ্যণীয় জাতি, বর্ণ, ভাষা, লিঙ্গ বৈষম্যের কারণে পিছিয়ে পড়ে সাধারণ প্রান্তিক পরিবারের সন্তানরা। পুনোইয়ের মনে হয় – "কত কী সুখ পড়ে আছে এখন মাঠে-ঘাটে বনে-বাদাড়ে, আর পুনোই কী না ইস্কুল ঘরে পড়ে 'গিরগিতি' খাচ্ছে 'গিরগিতি'! লেখা পড়া লোধাদের জাতে অসম্ভব ব্যাপার। সারাদিন বনে বাদাড়ে ছুটে বেড়ানো বাচ্চাদের কি আর ভালো লাগে স্কুলে একটানা বসে থাকতে? তবে নুকুটার হয়েছে। সে লেখাপড়া করার জন্য শহরে থাকে। লোকেরা আশঙ্কা করে তার বিয়ে নিয়ে কেননা তার যোগ্য পাত্র নিজ সমাজে পাওয়া দুষ্কর। জট্টাবুড়ির কথায়— "অতি বড় সুঁদ্ রী না পায় বর, অতি বড় ঘরণী না পায় ঘর?" বর্তমান সময়েও আদিবাসী গ্রাম গুলিতে জট্টা বুড়ির উক্তি শুনতে পাওয়া যায়। পীড়িত পুনোই চিরকালের জন্য স্কুল ছেড়ে চলে যাচ্ছে। তার মতে, ইস্কুলটা খারাপ, ইস্কুলের মাস্টাররা খারাপ, ইস্কুলের হাটুয়াছুয়ারা খুবই পাজি কিন্তু তবু... কোথাও যেন মায়া থেকে যায় স্কুলের প্রতি। কিছুদিনের স্কুলের স্মৃতি তাকে আবেগে অভিভূত করে দেয়। বহু আদিবাসী শিক্ষার্থীরাই এইসব পরিস্থিতিকে সামাল দিতে না পেরে স্কুল ত্যাগ করে কিংবা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে কঠিন পদক্ষেপ গ্রহণ করে নিজের জীবন নিঃশেষ করে দেয়।

তৃতীয় পর্বের শেষে দেখা যায়, লোধা শবরদের জীবন অন্য দিকে বাঁক নিয়েছে। তথাকথিত জীবন যাপন ও জীবিকাকে অন্য রূপ দিয়েছে ইতিমধ্যে অর্থাৎ দ্বিতীয় পর্বে দেখা যায় লোধা শবররা বনজঙ্গল থেকে অধিকার হারিয়েছে। নরসিঙা খেদিয়েছে লোধাদের। অরণ্য আইনের আওতায় এখন বন জঙ্গল। জঙ্গলমায়ের উপর জঙ্গল সন্তানদের কোন অধিকার নেই আর। অন্যদিকে দেখা যায় গেঁড়াশবরের মৃত্যু। যার মৃত্যুতে একটা গোটা প্রজন্মের সমাপ্তি ঘটেছে। তার সাথে ধ' গাছটাও শেষ হয়ে গেল। যা ছিল এতদিনের সঙ্গী, রাইবু সোমবারিকে হারানোর পর ধ' গাছটিকে নিজের বোন ভেবে ছিল। দুঃখে-কষ্টে যার তলায় গিয়ে কষ্ট নিবারণ করত সেই গাছটিকে গুরভা কেটে ফেলে গেঁড়েশবরের চিতায় দেওয়ার জন্য। যে গেঁড়েশবর কিনা বলত, 'মানুষের থিক্যে গাছ অনেক বড়।' আদিবাসীদের কাছে প্রকৃতি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বহন করে। বন জঙ্গল থেকে নানা উপাদান নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে থাকে। এছাড়াও গাছপালাকে দেবতা জ্ঞানে শ্রদ্ধা করে থাকে। বেশিরভাগ পূজা-পার্বণে বিভিন্ন গাছের ডাল পাতা ছাড়া আচার-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় না। বিশেষত শালগাছ, আমগাছ, নিমগাছ ও মহুলগাছকে এরা অত্যন্ত পবিত্র বলে মনে করে। তাই বন-জঙ্গল তাদের জীবন ও সমাজের জন্য অতিব প্রয়োজনীয়। এই বিষয়ে চর্চা করলে দেখা যায় ব্রিটিশদের কিংবা বর্তমান ক্ষমতাশালীদের হাতে বন জঙ্গল যত না সুরক্ষিত তার চেয়ে বেশি সুরক্ষিত ছিল আদিবাসীদের হাতে। গাছপালা নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করলেও একেবারে নিঃশেষ করে কখনোই ব্যবহার করত না। যেহেতু প্রজন্মের পর প্রজন্ম বন জঙ্গলের ওপর নির্ভর করে তাদের দিন কাটাতে হয় এই কথা মাথায় রেখেই তারা প্রকৃতিকে নিজের কাজে ব্যবহার করত। শবর রাজা রাইবু ও গুড়গুড়িয়াকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেলে বিপুল পরিবর্তন আসে লোধা শবরদের জীবনে। অরণ্য আইনের ফলে বন জঙ্গল থেকে তাদের অধিকার খর্ব হয়ে যায়। বন জঙ্গলে ঢুকতে না পারায় তাদের প্রত্যেকদিনের জীবনযাপনে গভীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তাদের জীবনে ভাটা পড়ে যায়। উপায়ান্তর খুঁজতে গিয়ে তারা নিলু ও গুরভার পরামর্শ মেনে 'নামাল' যাওয়ার কঠিন সিদ্ধান্ত নেয়। এই পর্বের শেষে দেখা যায় জঙ্গলমায়ের গর্ভ থেকে বিতাড়িত হয়ে তারা পূবে 'নামাল' যাওয়ার জন্য বেরিয়ে পড়ে। যারা কখনো জঙ্গল জীবন ছাড়া অন্য জীবন ভাবতে পারেনি তারাই একদিন জীবন সংকট ও কর্ম সংকটে পড়ে পূবে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। সেখানে তারা কামিন খেটে নতুন জীবন শুরু করবে।

লোধা শবর নারীদের জীবনেও বদল আসে চতুর্থ পর্বে।যে নারীরা বন জঙ্গল থেকে কাঠ, পাতা, ছাতু, মহুল নানা রকম শাক পাতা তুলত; জমি-জলা থেকে মাছ, শামুক তুলে জীবিকা নির্বাহ করত। পাশাপাশি ঘুঁটে 'গঁইঠা' বানিয়ে গঁইঠা দিয়ে শামুক – শামকা পুড়িয়ে কলিচুন বানানো গোবরের নাদি জমিয়ে চাষের মরশুমে চাষীদের খত্ বিক্রি করা চাঁদবদনীর ও তার মায়ের আরেক কাজ! দোরখুলিতে বিভিন্ন ধরনের কাজ করে রোজগার করত। চাষের কাজে অনভ্যস্থ সেই মেয়েরাও নামালে গিয়ে চাষের কাজে নাম লেখালো। এই নামালে শুধুই ধান চাষের কাজে এসেছে তারা কিন্তু রাইবু কখনো সমর্থন করত না লোধা মেয়েদের কামিন খাটতে যাওয়ায় তার আপত্তি ছিল। রাইবুর অবর্তমানে গুরভার কথায় সকলে আসতে রাজি হয় তাছাড়া জঙ্গল থেকে অধিকার হারানোর পর আর তাদের কোন উপায় ছিল না রোজগারের। কেননা চাষবাস তাদের জাতেও নেই ধাতেও নেই। পূর্বপুরুষ থেকে তারা এই যাযাবর জীবন যাপনে অভ্যস্ত। আজ তারা সব হারিয়ে পুবাল এসেছে নামাল খাটতে। নারী-পুরুষ সকলেই হাজির হয়েছে 'নামালে' তার সাথে হাজির নারী-পুরুষের কিস্ সা চাঁদবদনীর প্রতি নীলুয়ার আসক্তি, আবার চাঁদবদনীর প্রতি স্বপন ভাতুয়ার নজর উপন্যাসে উপস্থাপিত করা হয়েছে। জোৎস্না রাতে বামনদার বিলে সঙ্গমক্রীড়ারত এক নারী-পুরুষ যুগলকে দেখে স্বপন ভাতুয়া আশঙ্কা করেছে তারা হয়তো চাঁদ বদনী ও নিলুয়া। স্বপন ভাতুয়ার সাথে মেলামেশা করায় ঈর্ষান্বিত নীলুয়া এই রাতে চাঁদ বদনীকে চুলের মুঠি ধরে টেনে হিঁচড়ে তাকে এতদূর এনেছে হয়তো! –

> "ব্যাধের জাত। সিনেমা ভিডিওয় স্বপনভাতুয়া কতই তো দেখেছে - জাতের মেয়ে যদি বেজাতের ছেলের সঙ্গে পালাতে চায়, কোন রকম ফষ্টিনষ্টি করে, তবে সে-মেয়েকে তারা ছেলেটার সঙ্গে জ্যান্ত পুঁতে ফেলে! নতুবা ছেলেটাকে গুম করে দেয়।"[১০]

বর্ণবৈষম্য যে শুধুই উচ্চবর্ণে লালিত হয়, তা নয় আদিবাসী গোষ্ঠী সম্প্রদায়েও বর্ণবৈষম্যের ভয়ংকর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। আদিবাসী মেয়েদের প্রেম বিবাহ স্বীকৃতি হলেও, বেজাতে বিবাহ কখনো স্বীকৃত হয় না। কুমহার সন্তোষকুমারের ও সাবিত্রীর বিবাহে গলযোগ তার উদাহরণ। আবার প্রসঙ্গ এসেছে এক রাজু এক লোধা ছুকরিকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে পেট বাঁধিয়ে ভিকা ভক্তার কাছে কী দণ্ডটাই না পেয়েছিল। আদিবাসী সম্প্রদায়ে বহু দৃষ্টান্ত এমন রয়েছে যেখানে বেজাতে বিবাহ করার ফলে ভয়ানক পরিস্থিতির কবলে পড়তে হয়েছে উভয় প্রেমিক যুগলকে। নিজেদের সমাজ সংস্কৃতিকে বহিরাগতদের সাথে মিশিয়ে ফেলতে চায় না। কেননা এতে সমাজের ঐতিহ্য বজায় থাকে না। সংমিশ্রণের ফলে সমাজে অনেক রকম পরিবর্তন আসে যা তারা চায় না। নিজেদের সংস্কৃতিকে অমিশ্রিত রাখাই একমাত্র উদ্দেশ্য।

রাইবুর মতে 'নামালে' গেলে মেয়েদের মানহানি হয়। তারা পর পুরুষের সংস্পর্শ আসার সুযোগ পাওয়ায় চরিত্র নষ্ট হয়। তবে খেতে না পেয়ে মরার চেয়ে গতর খাটিয়ে রোজগারের পথকেই বেছে নিয়েছে তারা। কামিল্লার সাথে ঢলাঢলি করে চা পানির ব্যবস্থা করে, গয়না লোভে দিশেহারা হয়ে নিজেদের মধ্যে চলে প্রতিযোগিতা; কামিল্লার ঘনিষ্ঠ হবার জন্য। লোধানীরা পেটের জ্বালার কাছে বশ মেনে যায়, বঙ্কা, কামিল্লা, গিরিহা অদ্বৈতর মতো পরপুরুষের কাছে। ফুলকাটা চক্রাবক্রা শাড়ির লোভে নিয়তি লোধানীর চোখ লকলক করে ওঠে। নিজেদের শখ, স্ফূর্তি ও খাদ্যের জন্য তারা বিক্রি হয়ে যায়। হারিয়ে ফেলে লোধানীরা মান-ইজ্জত। শরাবণ লোধার মেয়ে মেলায় ঘুরতে গিয়ে আর ফেরেনা, হারিয়ে যায় চিরকালের জন্য কে বা কারা চাঁদবদনীকে ইটভাটায় তুলে নিয়ে গিয়ে শেষ করে দেয়। এখন ঘরের মেয়েকে ভাসান দিয়ে খালি হাতে ফিরতে হচ্ছে, রাইবুর বহিনটা গেল, গুড়খার বহিনটা গেল, তোর বিটিটাও গেল, ভুবনার মেয়্যাটাও যাব যাব করছে— সেদিন দেখলি নাই একটা বেজাতের পরপুরুষের সঙে— একের পর এক স্বজাতির মেয়েদের হারিয়ে তারা নিঃস্ব। আশঙ্কায় কাটায় জীবন। নিজেদের সমাজ জীবনকে হাজার চেষ্টা করেও সচল রাখতে পারে না এই মানুষগুলো। উপন্যাসের দুই নারীচরিত্র সোমবারি ও চাঁদবদনী স্পষ্টবাদী প্রাণচঞ্চল মেয়ে ছিল। রাইবুর বোন সোমবারিকে হরণ করে এক সাধু। উপন্যাসে দুই নারীকেই লোধা সমাজ হারিয়ে ফেলে। উচ্চবংশীয়দের লোলুপ দৃষ্টি দুই লোধা মেয়েকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়।

> "— গাছগুলাই যদি মরে যায় সব ফল ধরবে কুথায়? আর ফল নাই ধরলে লোধাবংশ নির্বংশ হবে নির্ঘাত। হঁ কী নাই? – গুরভা।"[১১]

লোধাশবর জাতির সমাজজীবনে যে বিশৃঙ্খলার করাল থাবা দেখা যায় তার উৎস কোথাও না কোথাও গিয়ে একটা বাঁধা ধরা অপবাদ। যেই তকমার দরুণ আজও আর পাঁচটা কাজ থেকে তাদের দূরে রাখা হয়। চরম জীবন সংকটে নীতি আদর্শ ভুলে তাই গাছ চুরির ধান্দায় জড়িয়ে পড়ে। আর আদিবাসী সমাজের মেয়েরা বিচিত্র সব কাজের জগতে প্রবেশ করে। নতুন জগতে এসে সেখানকার চোখ ধাঁধানো আলোয় হকচকিয়ে উঠে। গ্রাম, সমাজের গণ্ডি পেরিয়ে গা ভাসিয়ে দেয় জোয়ারে। সুযোগ পেয়ে ঠিক ভুলের বিচার না করে মেলামেশা করতে শুরু করে বেজাতে পুরুষদের সাথে। সেই মায়াজাল ছিঁড়ে কেউ বা ফিরে আসে কেউ অতলে তলিয়ে যায় চাঁদবদনীর মতো। তবে সচেতন বুদ্ধিমতী কিশোরী নুকু ওরফে কুমারী লক্ষীরাণী মল্লিক উপর সমগ্র লোধাশবরদের আশা আছে সে একদিন তাদের মুখ উজ্জ্বল করবে, সে বাকিদের মতো হারিয়ে যাবে না...।

Reference:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, সুভাষচন্দ্র, 'জঙ্গলমহলের জনজীবন ও লোকসংস্কৃতি', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা ০৯, প্রথম প্রকাশ জুন, ২০১২, পৃ. ৩৮

২. https://dwaipayaan.blogspot.com/2014/10/blog-post_22.html?m=1 (নলিনী বেরার সাক্ষাৎকার, গ্রহীতা অন্তরা চৌধুরী)

৩. বেরা, নলিনী, 'শবরচরিত', করুণা প্রকাশনী, কলকাতা ৯, পৃ. ৭৩৬

৪. তদেব পৃ. ২৫

৫. তদেব, পৃ. ৫২

৬. তদেব পৃ. ৬১

৭. তদেব পৃ. ১৫৬

৮. তদেব পৃ. ২৪৭

৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণী, 'নারী শ্রেণী ও বর্গ নিম্নবর্গের নারীর আর্থসামাজিক অবস্থান', মিত্রম, কলকাতা ৭৩, (প্রথম মিত্রম সংস্করণ এপ্রিল ২০০৯), পুনমুদ্রণ জানুয়ারি, ২০২৩, পৃ. ১০

১০. বেরা, নলিনী, 'শবরচরিত', করুনা প্রকাশনী, কলকাতা ৯, পৃ. ৫১৯

১১. তদেব পৃ. ৭৩১

Bibliography:

ঘোষ, শাশ্বতী, 'ভারতীয় সমাজ ও নারীশ্রম', অনুষ্টুপ, কলকাতা – ৯, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০২৩

ঘোষ, শাশ্বতী, 'সমতার দিকে আন্দোলনে নারী : প্রথম পর্ব', প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা – ৭৩, (প্রথম প্রকাশ: জুন, ১৯৯৯) পুনর্মুদ্রণ: জানুয়ারি, ২০০৭

বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণী, 'নারী শ্রেণী ও বর্গ নিম্নবর্গের নারীর আর্থসামাজিক অবস্থান', মিত্রম, কলকাতা ৭৩, (প্রথম মিত্রম সংস্করণ এপ্রিল ২০০৯), পুনর্মুদ্রণ জানুয়ারি, ২০২৩

বন্দ্যোপাধ্যায়, সুভাষচন্দ্র, 'জঙ্গলমহলের জনজীবন ও লোকসংস্কৃতি', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা ০৯, প্রথম প্রকাশ জুন, ২০১২

রাণা, কুমার, বাস্কি, বড়ো, 'আদিবাসী ভারত', অনুষ্টুপ, কলকাতা- ৯, প্রথম প্রকাশ: জুলাই ২০২৪

সরকার, সুনীতি, 'নলিনী বেরার উপন্যাস প্রান্তবাসীর বিশ্বায়ন', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা ০৯, প্রথম প্রকাশ কলকাতা বইমেলা, ২০২৫